বিষন্ন কোকিল

খন্দকার মোঃ আবদুল গণি

অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে জীবনের প্রায় মধ্যাহ্নে এসে দু'টো সার্টিফিকেটর মালিক হয়েছি। এ দু'টো সার্টিফিকেট হাতে নিয়ে প্রায়ই ভাবি এতটা কষ্ট করে এ দু'টো অর্জন না করলেই ভাল হত। বর্তমানকালে এদেশে নিম্ন মধ্যবিত্ত সমপ্রদায়ের মৌলিক অধিকার সংস্থান করার মোক্ষম পথ আছে দু'টো। হয় ব-কলম হয়ে ছেলেবেলা থেকে কোন কর্মে দীক্ষা নেওয়া নতুবা কষ্ট করে হলে ও উচ্চশিক্ষার চৌকাঠ ডিঙানো। অবশ্য ব-কলম সমস্ত মৌলিকতা পূর্ণ হয় না। মনের মাঝে খুঁতখুঁতে ভাব থেকেই যায়। অর্ধশিক্ষিত হওয়া মানে অনেকটা পঁচে যাওয়া। কোনকূলেই জীবনতরীটি ঠিকমত ভেড়ানো যায় না। কূল আর তরীর মাঝে ফাঁক থেকেই যায়। শেষকালে ফাঁক কিছুটা কমানোর জন্য চাকরি নিলাম এক মুদিখানার দোকানে। কিন্তু বিধি বাম মালিকের যা আয় হত তার চেয়ে বেশি হত ব্যায়। অনন্যোপায় হয়ে মালিক দোকান বিক্রি কওে দিলেন আর আমিও চাকরি হারিয়ে সাবেক অবস্থায় পৌঁছলাম। তারপর অনেক কষ্টে বেশ কিছুটা দিন অতিবাহিত হবার পর পুণরায় চাকরি জুটল অজ পাড়া গাঁয়ে এক বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। খাওয়ার জায়গা হল একটি লজিং-এ এবং থাকার জায়গা হল জন-মানবহীন এক প্রবাসীর পরিত্যাক্ত কুটির ঘরে। আর চাই কি? এইত ঢের।

এই বাড়ীতে এসেছি প্রায় অর্ধবছর হতে চলল কিন্তু মানুষজনকে আজও পর্যন্ত এ বাড়ীর চৌকাঠ ডিঙাতে দেখিনি। ছেলেবেলা থেকেই যেচে কারও সাথে কথা বলার অভ্যেস আমার ছিলনা। উপযাচক হয়ে কেউ কোনকিছু জিজ্ঞেস করলেই শুধুমাত্র তার জবাব দিতাম। কোন মানুষজন নেই বিধায় প্রকৃতির সাথে বন্ধুত্ব করেই সময়টা পার করে দেই। এ বাড়ীতে আসা অবধি ষড়ঋতুর রঙে বঙ্গভূমির বিভিন্ন ঢঙের সাজ দেখেই চলেছি। কখনো চারপাশে রূপের আগুন আর কখনো শান্ত-শিষ্ট নতুবা ভৈরবী মূর্তি। এত পারে প্রকৃতিদেবী ক্ষণে তার রূপ বদল করতে! এইত কদিন আগে শীতের বুড়ির রুক্ষ মূর্তি প্রত্যক্ষ করলাম। এখন সে চলে গেছে কিন্তু শুনেছি যাবার আগে ও পাড়ার কয়েকজন মুরব্বীকে সংগে করে নিয়ে গেছে। শীতের বুড়ির শীতল নিঃশ্বাসে পতনশীল পত্রঝরা বৃক্ষের সমস্ত পাতা ঝরে উদ্ধত উলংগ কংকাল আকৃতি ধারণ করেছিল। আর এখন? এ বাড়ীর চারপাশে যেন রূপের আগুন ঝরে পড়ছে। পূর্ব পাশের কৃষ্ণচূড়া গাছ লোহিত বর্ণে সেজেছে। শিমূল গাছটিও তাই। অযত্নে আর লতা-পাতায় ঘেরা বাড়ীর উত্তরপাশে যে অগোছালো বাগান আছে সেই অগোছালো বাগানে আগাছার সাথে পাল্লা দিয়ে যে সমস্ত গোলাপ, গাঁদা, রক্তজবা ফুলের শাখা দাঁড়িয়ে আছে সেই শাখায় এখন অজস্র ফুল ফুটেছে। বাহারী ফুলের বাহারী সাজে এ বাড়ীর চারপাশটা সজ্জিত। দেখে মনে হয় কোন উঠতি তরুনী হঠাৎ খেয়ালী বশে বিভিন্ন রঙের পাতলা মিহীন শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যুষেই দিন ভালই কাটছিল। কিন্তু আকস্মাৎ দু'দিন হতে পাশের বাড়ীতে রমনী কণ্ঠে কে একজন যেন ভক্তির ভজনগীতি বেসুরো গলায়, গাওয়া শুরু করে দেয়। ঘুম ভেঙ্গে যায়। দোর খুলে বারান্দায় এসে চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ি। তারপর শুরু হয় পাখিদের আনাগোনা। সবার আগে দোয়েল তারপর শালিক, বুলবুলি, টুনটুনী কোথা হতে এসে কলকাকলীতে ভরে তোলে বাড়ীর চারপাশটা। কাক,বক এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অতিথী পাখি আসতেও ছাড়েনা। এখন এসেছে কোকিল। আজ সকালে পূর্বরাত মত ঘুম ভেঙে

যাওয়া মাত্র বারান্দায় এসে বসলাম। শিমূল শাখে বসে একটি কোকিল বিষন্ন মনে গেয়েই চলেছে। কোকিলের এ করুণ সুর আমার সুপ্ত মনের গোপন কুঞ্জে গিয়ে আঘাত হানল। নিঃসঙ্গ জীবনে সঙ্গীর অভাব মনে করিয়ে দিল। মানুষের ফোঁড়ায় তীব্র ব্যাথা থাকলেও তার চারপাশে টিপে মানুষ শান্তি পায়। স্মৃতি নামক যে ফোঁড়া আমার মনের চারপাশে ব্যাথা সৃষ্টি করেছে কোকিলের স্বরের সাথে সেই ফোঁড়া টিপেই চলেছি। হঠাৎ নুপুরের নিক্কন ধ্বনী শুনে চম্‌কে উঠলাম। চেয়ে দেখলাম সাদা ধবধবে বিধবার শাড়ি পরে কুড়ি-একুশ বছরের এক সুশ্রী তরুনী হাতে ফুলের ডালা নিয়ে ছয়-সাত বছরের একটি মেয়েকে নিয়ে বাগানে প্রবেশ করছে। তারপর সেখানে প্রবেশ করে রক্তজবা আর গাঁদা ফুল তুলছে। ছোট্ট মেয়েটির চরণে রিনিঝিনি নুপুর ধ্বনী বাজছে। চেয়ে দেখলাম কিন্তু কিছুই বললাম না। যেভাবে এসছিল ঠিক সেভাবেই ফুলের ডালি ভরে নিয়ে চলে গেল।

পরের দিন সকালে ভজন শুনতে পাইনি বলে ঘুম ভাঙেনি। দোয়েল-কোকিল-বুলবুলির চিকন সুর কানে প্রবেশ করলেও তা মস্তিষ্কে অনুরন সৃষ্টি করতে পারেনি বলেই বুঝিবা চোখ খোলেনি। দরজায় কড়া নাড়ানোর শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল। খুলে দিতেই দেখি গতদিনের সেই মেয়েটি আহত এক কোকিল নিয়ে আমার দ্বারের সামনে এসে হাজির। মিনতি ভরা কণ্ঠে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল– একটু জল হবে, দাদা? কোকিলটা আহত হয়ে পড়ে ছিল। একটু জল খেতে দিতে হবে যে! ত্বড়িৎ গতিতে এক গ্লাস পানি এনে দিলাম। হাত থেকে পানি নিয়ে মাতৃস্নেহে কোকিলটির ঠোঁট দু'টো ফাঁক করে পানি খাওয়াতে লাগল। কোকিলটি ও পরম তৃপ্তিতে গলা কাঁপিয়ে তা পান করে গলা ভিজিয়ে নিল। তারপর মেয়েটি কোকিলটির মাথায় দু'ফোটা জলের ছিটা দিয়ে দু'হাতে তুলে উপরের দিকে ছুঁড়ে মারল। সামনে কাৎ হয়ে পড়ে তারপর ডানা ঝাপটিয়ে কোকিলটি উড়ে গিয়ে শিমূল শাখে বসল। কোকিলটি উড়ে যাবার পর আমার দিকে চেয়ে একগাল মিষ্টি হেঁসে বলল- বড্ড উপকার করলেন, দাদা। অসময়ে ঘুম ভাঙানোতে আমি দুঃখিত। না না তা কেন? আপনার এতটুকু উপকার করতে পেরে আমি ধন্য, পরিতুষ্ট। এখন যাই দাদা। পূজোর সময় চলে যাচ্ছে। মেয়েটি চলে গেল। অবাক বিষ্ময়ে আমি তার গন্তব্যের পানে চেয়ে রইলাম। যখন সে অদৃশ্য হয়ে গেল তখন নিজের ঘরে প্রবেশ করে প্রাত্যহিক কর্মে নিয়োজিত হলাম ঠিকই কিন্তু মন পড়ে রইল। সকালে ঘটে যাওয়া ঘটনার উপর। দিন গড়িয়ে চলল। ধীরে ধীরে আমার মনের ওপর মেয়েটির ছায়া পড়তে লাগল। যে বেসুরে ভজনগীতি একদা মনে বিরক্ত সঞ্চার করত ক্রমে সেই ভজন শোনার জন্য মনটা অস্থির এবং অশান্ত হয়েই চলল। কোথাও কোন নারীমূর্তি দেখলে তার পাশে জেগে উঠে আর ও একটি মুখ আর মনটা তাকেই আবৃত করে ঘুরতে লাগল। হাজার চেষ্টা করেও কোনমতে চোখ ফিরাতে পারতামনা। একদিন ফুল নিতে না এলে ব্যাথায় সমস্ত মনটা টন টন করে উঠত। এ আমার কি হল? চোখের চাউনিতে সে কথা কয়। সত্যের অন্তর্যামী নিভৃত অন্তরের মধ্যে কেবলই তাকে কামনা করতে লাগল। মনে হতে লাগল যে সরু পথ দিয়ে সে বাগানে প্রবেশ করে সেই পথের ওপর লুটিয়ে পড়ি ও দু'টি চরণ তলে। আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখতাম কিন্তু সামনে যেতে ভয় করত। চোখের নেশা নয়, হৃদয়ের গভীর তৃষ্ণা। এতে ছলনা কাপট্যের ছায়ামাত্র ছিল না, যা ছিল তা সত্যিই নিঃস্বার্থ, সত্যিই পবিত্র,

বুকজোড়া ভালোবাসা। চীৎকার করে কেবলই বলতে ইচ্ছে করে "হে প্রেমের দেবতা আমার বুক জুড়ে যে কামনার শিখা দাউ দাউ করে জ্বালিয়েছ সে শিখা তার মনেও জ্বালাও, সেও আমারই মত অনুভব করুক প্রেমের তীব্র জ্বালাময়ী সূধা। কিন্তু, প্রেমের দেবতা আমার প্রতি রুষ্ট। শিখা জ্বালিয়ে আর নিভা-ল-না। আগে যেভাবে ফুল তুলতে আসত সেভাবেই ফুল তুলে নিয়ে সে চলে যেত। মনে মনে বলতাম "কোকিল আরও একবার আহত হ-ভাই, তোর কষ্ট হলেও তোর কল্যানে তাকে আমার সামনে দেখে অতৃপ্ত হৃদয়কে তৃপ্ত করি। সুপ্ত কথা আর কতদিন এভাবে রাখা যায়? এঁদো ডোবার তলদেশে মিথেন গ্যাস যেভাবে বুদবুদ করে ভেসে উঠে সেভাবেই লুকানো কথা বারবার মনের মাঝে ভেসে উঠে। কিন্তু ভাসলেই তো হবেনা তার প্রকাশ চাই। একদিন সিদ্ধান্ত নিলাম যেভাবেই হোক আজ তা অবমুক্ত করবই। চোখ মেলে বাগানের দিকে তাকিয়ে দেখলাম ছোট মেয়েটি আজ আসেনি। যার জন্য এত উৎকণ্ঠা সে একাই নিবিষ্টমনে ফুল তুলে যাচ্ছে। গুটি গুটি পায়ে বাগানে প্রবেশ করলাম। চোখ তুলে মেয়েটি আমাকে দেখে সলজ্জভাবে সাদা ধবধবে শাড়ির আঁচল খানি মাথার ওপর টেনে দিয়ে ডান পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল– কিছু বলবেন দাদা? আপনি কে? সেটা জানা কি খুবই প্রয়োজন? হ্যাঁ। আপনার পাশের বাড়ীর নারায়ণ বাবুর শ্যালিকা, লাবণী। এমন মায়াময়ী যার মুখ তার নাম লাবণীই তো হবে। কি আপনার অঙ্গে বিধবার শাড়ী কেন? এ শাড়িতে আপনাকে মানায় নি। না মানালে কি করব বলুন। স্বামী মরে গেলে বাংলাদেশের সনাতন ধর্মাবলম্বী রমনীদের এ শাড়িই যে পরতে হয়। প্রায়শ্চিত্ত আর কি? স্বামী মারা গেছে! জ্বী দাদা। স্বামী মরে গেছে বলে এই মনে বার্ধক্য এনে এই রূপের আগুন সাদা শাড়ির আড়ালে ঢেকে রাখতে চাইছেন কেন? দেখুন প্রকৃতির চারপার্শ্বে সুন্দরের আগুন খেলা করছে। এই সুন্দরের মাঝে নিজেকে সুন্দর করে সাজিয়ে বাঁচতে ইচ্ছে করে না? -দাদা! – হ্যাঁ লাবণী দেবী। এই দেবীর মত রূপ দুখের আড়ালে ঢেকে নিরানন্দ জীবন-যাপন করার কোন মানেই হয় না। – কিন্তু এটাই যে আমার প্রাপ্য। – প্রাপ্য নয়! স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছেন। আচ্ছা, কেউ যদি আপনার এই সাদা শাড়ি খুলে, লাল বেনারসী শাড়ী পরিয়ে দেয়, আপনি পরবেন? তেমন কারও সন্ধান পেয়েছেন নাকি? পেলে আমাকে জানাবেন, ভেবে দেখব। এখন আমি যাই, পূজোর সময় চলে গেল বলে...। আর দাড়াল না। অতি দ্রুত সামনে হেঁটে গিয়ে থম্‌কে দাড়িয়ে পেছনে একটু চেয়ে কাজল কালো আঁখির কৌতুকভরা বাঁকা চাহনীর বাণ আমার দিকে নিক্ষেপ করে চলে গেল।

পরদিন সকালে ভক্তির ভজনে ঘুম ভেঙে গেল। আশান্বিত মন নিয়ে বারান্দায় এসে বসলাম। আমার প্রতিদিনের সংগী, সাথীরা একে একে সকলেই এল কিন্তু যার জন্য এমন প্রতীক্ষা সেই শুধু এল না। বাগানের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে চোখ দু'টো ব্যাথায় টনটন করে উঠল। ভাং খেয়ে নেশায় আক্রান্ত ব্যাক্তি যেভাবে ঝিমুয়, বারান্দায় বসে সেভাবেই ঝিমুতে লাগলাম। বার বার ভাবতে লাগলাম তবে কি আমার মনের গোপন কথা বুঝতে পেরেছে? আর তা পেরে আমাকে ত্যাগ করে চলে গেছে? গেলে যাক্। যে কথা বলেছি তা তো একদিন বলতেই হত। বলতে না পারলে নিজের মনের মাঝে ক্ষোভ জন্মাত। অবমুক্ত করে মনকে দায়মুক্ত করেছি। কতক্ষণ তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলাম জানিনা। হঠাৎ ছোট মেয়েটি এসে আমাকে ডেকে তুলে বলল- সাঈদ কাকা, মাসীমা আপনাকে ডেকেছে। - কোথায়! কোথায় তোমার মাসীমা?- ঐ বাগানের ঐ দিকটায়। লাফ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। বাগানের কোণে পৌঁছে দেখি লাবণী দেবীর মুখে লাবণ্যের ছায়ামাত্র নেই। সোনার মুখখানি বিষাদে পাংশু বর্ণ ধারণ

করেছে। এ দীন ও মূর্তি দেখে বুকের মাঝে ধক্ করে কষ্ট এসে ধাক্কা দিল। নিতান্ত অপরাধীর মত বলে উঠলাম– আমায় ডেকেছেন লাবণী দেবী?– জ্বী। আপনাকে দু'টো কথা বলতে চাই।- জ্বি বলুন।- আমি জানি গতকাল আপনি যে কথাটি বলেছেন তা আপনারই মনের কথা। কিন্তু, আমি যে আমার হারানো স্বামীকে দেবতার পদতলে খুঁজে পাই। তার পায়ের নীচে নিজেকে সমর্পণ করে পরমতৃপ্তী বোধ করি। দোহাই আপনার, আমাকে আমার সাধনা থেকে ছিট্‌কে ফেলে দেবেন না। – কিন্তু আমি ও যে আপনাকে একমনে প্রার্থনা করি। আমার প্রার্থনার ভাগ কি শূন্যই পড়ে রবে? সেই শূন্যতাকে অন্য কাউকে দিয়ে পূর্ণ করুন। তাছাড়া আমরা দু'জনেই ভিন্ন জাতির। - আপনি শিক্ষিতা-বুদ্ধিমতী। আধুনিক কালে এসেও জাত নিয়ে কথা বলছেন! তাছাড়া সংস্কারকগণ বিধবা বিবাহের প্রচলন করেছেন। - করেছেন। কিন্তু তা জাতের মধ্যে। বি-জাতীর মধ্যে নয়।- আবারও সেই জাত? মানুষের শ্রেষ্টত্ব তার মনুষ্যত্বে। জাতে নয় লাবণী দেবী। - জাতেই। আধুনিক যুগ একথা ঠিক্। আধুনিকার ছোঁয়া মানুষের মনে লাগেনি, লেগেছে পোশাক-পরিচ্ছেদে আর আচার-আচরণে। জাত নিয়ে যদি ভেদাভেদ নাই থাকবে তবে সারা পৃথিবীতে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টানে এত দ্বন্ধ লেগে থাকত না। শুধু যদি মানুষ নামক একটি সম্প্রদায়ই থাকবে তবে ধর্মক্ষেত্রে একে-অপরের ওপর এভাবে শ্রেষ্টত্ব জাহির করতে উঠেপড়ে লাগত না। - তবে চলুন, জাতী ভেদ সমাজের বাইরে কোথাও গিয়ে নতুন পরিচয়ে বাঁচি। যেখানে আমি মুসলিম আর আপনি হিন্দু এ কথা কেউ জানে না।- যেতাম যদি কারও গর্ভে না জন্মাতাম। কারও আদর-স্নেহে লালিত-পালিত না হতাম। এ হয়না। প্রভাতের স্বপ্ন ভেবে ভূলে যান। আমি আর সহ্য করতে পারছি না ...। আমি আমার প্রেমের ষোল আনা বুঝে পেয়েছি লাবণী দেবী। আর চাইনে..। আপনি আমাকে না চাইলে ও চোখ হতে জল ঝরে পড়ত না। - জানিনা ...। আমি কিচ্ছু জানিনা..। ভীত হরিণী যেভাবে ছুটে পালায় সেভাবে লাবণী ছুটে পালাল। পিছে ফেলে গেল মুক্তোর মত আঁখি নিঃসৃত কয়েকফোঁটা জল।

পরদিন সকালে ভজনগীতি কানে এলনা তথাপি সকাল সকাল ঘুম ভেঙে গেল। চেয়ারে হেলান দিয়ে লাবণী আর আমার ঘটে যাওয়া কাহিনীর পাতা উল্টাচ্ছি এমন সময় নারায়ণ বাবুর মেয়েটি যে ছিল আমাদের ঘটনার স্বাক্ষী সে এসে রঙিন কাগজে মোড়ানো একখানি চিটি আমার সামনে মেলে ধরে বলল- কাকা, মাসীমা তোমায় দিয়েছেন।

তাড়াতাড়ি হাত থেকে চিঠি নিয়ে তা খুলে চোখের সামনে মেলে ধরলাম। তাতে লেখা ছিল –

দাদা,

জীবনে দুখের ভার বইতে বইতে সে ভার বইতে বইতে সে ভার সয়ে গেছে। বেশ কয়দিন থেকে হঠাৎ আপনাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলাম কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়াল আমার পূর্বস্মৃতি। ভালোবেসে আমি যতীনকে বিয়ে করেছিলাম। তার স্মৃতি আমি আজও ভূলতে পারিনি। মাঝে আসলেন আপনি। দ্বিধা-দ্বন্ধে যখন ভুগছিলাম তখন স্বপ্নে আমার স্বামী যতীন এসে আমাকে তিরষ্কার করে বলে উঠর- " একি! লাবনী, অন্ধ মোহে আমার সোহাগ ভরা স্মৃতি এক নিমেষে ভুলে যাবে, আমি তা দেবতার পদতলে পড়ে আছি, তার পূজো করে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দাও। বিশ্বাস কর মৃত্যুদূতের হাত থেকে বাঁচতে ক্ষমতা থাকলে আমি কাম্মিনকালে ও তোমাকে ছেড়ে আসতাম না "। আমি আর এখানে থাকতে পারলাম না। এক বুক স্মৃতি নিয়ে চলে গেলাম। আমার অক্ষমতার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন। ইতি,

" লাবনী "

চিটি পড়তে পড়তে চোখ ঝাপসা হয়ে এসেছিল। অশ্রু শুকিয়ে যাওয়া মাত্র উপরের দিকে চোখ তুলে তাকালাম। দেখলাম সেদিনের সেই কোকিলটি শিমূল শাখে বিষন্ন মনে বসে আছে। মিনিট খানেক পরে হঠাৎ করেই কোকিলটি করুন সুরে তার স্বভাবসিদ্ধ গান গাইতে লাগল। কোকিলের গীত অনেক শুনেছি কিন্তু আজ যেন ব্যাতিক্রমী। সুরে যেন সমস্ত রাজ্যের বিষাদ এসে জমা হয়েছে। বোধ হয় হাজার বছরেও কোন কোকিল এমন বিষন্ন সুরে গান গায়নি।

খন্দকার মোঃ আবদুল গণি, নিতাই নগর, বড়ইগ্রাম, নাটোর